১৯-১০-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাহায্যকারী হয়ে সবাইকে নতুন দুনিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে উৎসাহিত করার পুরুষার্থ করাও। তুমি নিজে যেমন এই জ্ঞানে জ্ঞানী হয়েছ, অন্যদেরকেও তেমন করে গড়ে তুলতে থাকো

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, তোমাদের এখন কোন্ স্মৃতিতে থাকা উচিত ? এই স্মৃতির চমৎকার কি প্রকারের?

উত্তর :- সর্বাগ্রে তোমাদের প্রয়োজন, সৃষ্টিরূপী কল্প-বৃক্ষের বীজ ও তার বিস্তারের জ্ঞানকে জানা। সেই জ্ঞানের স্মৃতিই যথার্থ রূপে তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে। সঠিক উপায়ে সেই স্মৃতি রাখতে পারলেই তোমরা চক্রবর্তী-রাজা হতে পারবে - এটাই স্মৃতির চমৎকারিত্ব। তাই তো বাবা বাচ্চাদের স্মৃতিকে জাগ্রত করাচ্ছেন - যে বাচ্চারা অর্দ্ধ-কল্প ধরে এত ভক্তি করে এসেছো তোমরা, তোমাদের কি সেই স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে এখন ? তোমাদের সেই ভক্তির ফল দিতেই আমি এসেছি। আবারও তোমরা (বি.কে.-রাই) সেই বৈকুন্ঠ-ধামের মালিক হতে চলেছো। বাবা স্বয়ং যেমন অতি মিষ্ট স্বভাবের - বাবার এই জ্ঞানও ততোধিক মিষ্টি । তা যতই স্মরণ করতে থাকবে, ততই সুখের অনুভূতি আসতে থাকবে।

গীত :- জাগ সজনিয়াঁ জাগ .....
(পরম-চৈতন্যের চৈতন্য-স্বরূপ সজনী আত্মারা, তোমাদের চেতনা জাগ্রত হোক, নতুন যুগের প্রভাতের আলো এই ফুটলো বলে।)

ওঁম্ শান্তি! মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা- গীত তো শুনলে তোমরা। আজ দীপমালার পর্ব অর্থাৎ দীপাবলীর উৎসব। দীপমালার প্রকৃত অর্থ নতুন যুগের প্রকাশ। সত্যযুগে কোনও দীপমালার পর্ব অনুষ্ঠিত হয় না, যেহেতু তখন সব আত্মারই পূর্ণ-জ্যোতি প্রজ্জ্বলিত থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে, নতুন দুনিয়ার রাজ্য-ভাগ্য লাভ করার জন্য শ্রীমৎ অনুসারে পুরুষার্থ করছো তোমরা। ফলে তোমরা এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছো। ত্রিকালদর্শী মানে, যার তিন কালের জ্ঞান থাকে, অর্থাৎ - যে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-কেও জানতে পারে। অতএব অন্যদেরকেও সেটাই বোঝাতে হবে তোমাদের। তোমরা নিজেরা যেমন বিকারী-কাঁটাতুল্য থেকে পবিত্র-ফুলতুল্য হও, অন্যদেরকেও ঠিক তেমন করেই গড়ে তুলতে হবে। অতীত (বিগত) দিনের ইতিহাস-ভূগোল জানা থাকলে- ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে, বর্তমানেই তার আভাস পাওয়া যায়। আর ভবিষ্যৎ-কে জানতে পারলে তো অতীত ও বর্তমানকেও জানা হয়ে যায়। এটাই জ্ঞানের পূর্ণতা। যেমন- কলিযুগ এখন তোমাদের অতীত, বর্তমান হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ আর ভবিষ্যৎ-এ আসছে সত্যযুগ ও ত্রেতা। তাই তো বাচ্চারা, তোমরাও সৃষ্টি-চক্রের এই জ্ঞানকে জেনে এবং নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থও করছো এবং তার সাথে-সাথে বাবার সাহায্যকারী হিসেবে অন্যদেরকেও সেই পুরুষার্থ করাবার প্রেরণা জুগিয়ে চলেছো। আমাদের এই বাবা হলেন 'বহুদিনের হারানো এবং তারপর অনেকদিন পর খুঁজে পাওয়া' আর আমরা তাঁর বাচ্চারা হলাম 'হারানিধি'। যেহেতু উভয়ের এই মিলন হচ্ছে ৫-হাজার বছর পর। আর তাই তো সজন বাবা স্বয়ং এসেছেন তার সজনীদের শৃঙ্গার করিয়ে নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যাবার জন্য। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো তা রয়েছেই- একেবারে উপরের মূলবতন থেকে সূক্ষ্মবতনের জ্ঞান। আর একমাত্র তোমরাই জানো কোন কোন ধর্মস্থাপক কখন কখন আর কিভাবেই বা এসে ধর্ম-স্থাপন

করে। এইসব জ্ঞানেই তো বাবা তোমাদেরকে জ্ঞানী বানিয়েছেন। তাই তো ওনাকে অতিশয় প্রিয় অর্থাৎ প্রিয়তম বলা হয়। অর্থাৎ সুমিষ্ট থেকেও অতি মিষ্ট যিনি। একমাত্র তোমরাই তা অনুধাবন করতে পারো, কোন পর্যায়ের মিষ্ট উনি। ওনার মহিমাও যেমন অপরমঅপার আবার ওনার থেকে আমরা যে আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকি, তার মহিমাও তেমন অপরমঅপার। নামগুলিও তেমন অপূর্ব : স্বর্গ, হেভেন, প্যারাডাইজ, বহিশ্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পরমাত্মাকেই আবার বলা হয় গড্-ফাদার, দুঃখ-হর্তা ও সুখ-কর্তা। সুতরাং ওনাকে আরও কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত। কিন্তু ড্রামার চিত্রনাট্য অনুসারে, তোমরা সেভাবে তাকে স্মরণ করতে পারো না। মুরলীর গীতগুলিও কত সুন্দর। তোমাদের প্রত্যেকের ঘরেই এমন তিন-চারটে রেকর্ড রাখা উচিত অবশ্যই। রেকর্ড গীত শোনার সময়, তখন বাবাকেও স্মরণে আসবে। একমাত্র তোমরা বি. কে. ব্রাহ্মণেরাই জানো, নতুন দৈবী-দুনিয়া স্বরাজ্য অর্থাৎ তা কেবল পবিত্র আত্মাদের দুনিয়া স্থাপিত হতে যাচ্ছে। লৌকিক পিতার থেকে আশীর্বাদী-বর্সার ধন-সম্পদ প্রাপ্তি হয়, কিন্তু উনি এমন কিছু দিতে পারেন না যা আত্মার পিতা পরমাত্মার থেকে পাওয়া যায়। তোমরা এও জানো যে, পূর্বে ওঁনার থেকে যে রাজ্য-ভাগ্যের প্রাপ্তি ঘটেছিল তোমাদের, তা তোমরা নিজেরাই খুইয়ে ফেলেছো। যদিও এখন আবার তা পেতে চলেছ। সত্যযুগে তোমরাই কত সুন্দর-উজ্জ্বল-গৌর-বর্ণের ছিলে, আর এখন কত ম্লান-কালো-কুৎসিতে পরিণত হয়েছো। তারই স্মরণে তো তোমরা বলে থাকো 'শ্যাম-সুন্দর'। অর্থাৎ এতদিন তোমরা শ্যাম ছিলে - কিন্তু এখন সুন্দর করে গড়ে তুলবার কারিগর সদগুরুকে পেয়েছো। এখন সদগুরু আর গোবিন্দ (কৃষ্ণ) দুই রূপই দাঁড়িয়ে আছে তোমাদের সামনে। তোমরা আবার এও বলো, গুরুদেব সবই তোমার মহিমা ..... তোমরা নিজেরাই এখন কৃষ্ণের মতন হতে চলেছো। এ তো তোমাদেরই স্নেহ-প্রীতির মহানতা যার দরুণ তোমরা আবার এমনই হতে যাচ্ছো। কিন্তু জগতের লোকেরা তো বলে, কৃষ্ণ নাকি মাঠে-ঘাটে গরু চড়াতো। আবার ব্রহ্মার নামেও তারা বলে, ব্রহ্মার বিশাল গোশালা ছিল। অথচ প্রকৃত অর্থে, না তো কৃষ্ণের আর না ব্রহ্মার, কারও-ই গোশালা ছিল না। গোশালা তো ছিল এই শিববাবার।

বাচ্চারা, উৎসবগুলির অন্তর্নিহিত অর্থগুলি তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো। সেই হিসাবে তোমরা এও জেনেছো যে, প্রকৃত দীপমালার উৎসব হয় সত্যযুগে। যে জ্যোতি লাগাতার জ্বলতেই থাকে। যেমন তোমাদের দীপমালা ২১-জন্ম ধরে লাগাতার জ্বলতেই থাকবে। এই দুনিয়ায় প্রতি বছরই যার স্মৃতি পালন করা হয়। আর তা এমন ভাবেই করা হয় যে, মনে করো আজ দীপাবলীর আলোয় আলোকিত করা হলো, কালই আবার তা নিভিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সত্যযুগে এমন যা কিছুই অনুষ্ঠিত হয় তা রাজ্যাভিষেকের মতন জাঁক-জমক ভাবেই করা হয়। সেদিন বিভিন্ন প্রকারের আতসবাজীও জ্বালানো হয়। তার তুলনায় এখানকার এই আতসবাজীর উৎসব যেন এক পয়সা তুল্য, এই সামান্যতেই আবার কত প্রকারের দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। অথচ সেখানকার উৎসবাদি হয় রাজ্যাভিষেকের মতন বিশাল জাঁক-জমক অনুসারে। এখানে কেউ রাজ্যের ক্ষমতা পেলে, কেবলমাত্র সেই দিনটাকেই বা প্রতি বছর সেই দিনকেই কেবল মানিয়ে থাকে। যদিও এখানকার এই রাজ্যভিষেকে কারও কোনও সুখ নেই মোটেই। যেহেতু সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই যে এখন ভ্রষ্টাচারী দুনিয়া। কিন্তু স্বর্গ তো শ্রেষ্টাচারী দুনিয়া। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন, "একবার ভেবে দেখো, আমি তোমাদের কত বুঝদার তৈরী করি।" এমন জ্ঞানী বাবাকেই তো বলা হয় ত্রিলোকীনাথ। যদিও উনি তিন লোকেরই নাথ অর্থাৎ মালিক, কিন্তু উনি স্বয়ং তার মালিক হন না। অথচ একমাত্র ওনারই এসব বিষয়ে সম্পূর্ন জ্ঞান আছে। কিন্তু উনি তোমাদেরকেই সেই বৈকুন্ঠের মালিক বানান। অতএব

তোমাদেরও কতই না খুশী হওয়া উচিত। অর্দ্ধ-কল্প ধরে তোমরা যার ভক্তি করে এসেছো, অবশেষে এখন সেই বাবার সন্ধান পেয়েছো। সেই বাবা স্বয়ং এখন তোমাদের স্মৃতিকে জাগিয়ে বলছেন, স্মরণ করো, স্মরণ করো আর স্মরণ করো। কিন্তু তা কাকে স্মরণ করবে ? --বাবাকে আর তার তার রচিত জ্ঞানকে। কল্প-বৃক্ষের বীজ আর তার বিস্তারকে। এই স্মৃতির দ্বারাই তোমরা সারা দুনিয়ার চক্রবর্তী রাজা হতে পারো। এই স্মৃতি-শক্তির কি আশ্চর্য ক্ষমতা, সত্যি, কি ছিলে তোমরা আর এখন আবার কি হতে যাচ্ছো। একেই বলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চমৎকারিত্ব । আত্মার বাবা পরমাত্মা স্বয়ং এই জ্ঞান শোনান। অথচ অজ্ঞতার কারণে জাগতিক শাস্ত্রকারেরা গীতা-শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম লিখে রেখেছে। যেখানে শিববাবা স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞান দিচ্ছেন উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ, নিজের মতন তৈরী করার লক্ষ্যে। যাতে তোমরা বৈকুন্ঠ-ধামের মালিক হতে পারো। যেমন জাগতিক ওকালতির আইন-কানুন পড়াশুনা করার সময় বিশেষ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে যে, আমি ব্যারিষ্টার হবই, তেমনি এই জ্ঞানের পাঠেও তোমরাও নিশ্চিত জানো যে, বর্তমানের এই কপর্দকহীন ভিখারী অবস্থা থেকে একেবারে রাজপুত্রে পরিণত হও তোমরা। আর তারও পরে আবার মহারাজাও হয়ে যাও। তাই বাবা স্বয়ং এখন শিক্ষক রূপে তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন।

লৌকিক জগতের নিয়মে বাচ্চারা ৫ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার কাছেই পড়াশোনা করে, তারপর তাকে শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, আর বৃদ্ধাবস্থায় সে নিজেই যায় গুরু কাছে। কিন্তু এখানে (যে কোনও বয়সেই) বাবার বাচ্চা হতে পারলেই, বাবা যেমন শিক্ষক রূপে শিক্ষা দেন আবার সদগুরু হয়ে সদগতি করিয়ে সাথে করে পরমধামেও নিয়ে যান। কিন্তু জাগতিক গুরুরা তো আর সাথে করে সেখানে নিয়ে যেতে পারে না। যেহেতু তারা নিজেরাই মুক্তি পায় না। তারা কেবল জাগতিক তীর্থ-যাত্রাতেই নিয়ে যেতে পারে। তোমরা যেমন পথ নির্দেশক পাণ্ডা, ওরাও তেমনই জাগতিক তীর্থ-যাত্রার পাণ্ডা মাত্র। এছাড়া ওদের সেই তীর্থ যাত্রায় যাওয়ার অর্থ কেবলই নুড়ি-পাথরে হোঁচট খাওয়া। আর একমাত্র তোমাদেরই এই বিশেষ জ্ঞান আছে। তাই তো তোমাদের খুব খুশীতেই থাকা উচিত। তোমাদের এই ছাত্রজীবনের আনন্দকে মোটেই ভোলা উচিত নয়। কিন্তু মায়া সেই আনন্দে থাকতেই দেয় না। মায়া তোমাদেরকে ছাড়তেই চায় না এই ভেবে যে, যদি কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে গিয়ে তোমাদের জীবনের অন্ত হয়ে যায়। একেই বলা হয় স্মৃতিলব্ধা। অতএব নিরন্তর ভগবানকে (বাবাকে) স্মরণ করতে থাকো আর আনন্দের জোয়ারে ভাসতে থাকো। যেখানে দুঃখের নাম-গন্ধও পর্যন্ত নেই। তাই তো তাকে বলা হয় জীবনমুক্তি। বাবা নিজে যেমন অতি মিষ্ট স্বভাবের ওঁনার এই জ্ঞানও ততোধিক মিষ্ট। এমন বাবার মহিমাই অপরম্অপার, অর্থাৎ যার কোনও শেষ সীমা নাই। ভক্তি-মার্গেও তো এমনই বলা হয়। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা তা বলতে পারো না, যেহেতু তোমরা এখন সর্ব-প্রকার জ্ঞান-ই পেয়েছো। অতএব তোমাদেরকে খুবই মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিচার করে দেখো, নিজের মধ্যে এমন কোনও বিকার নেই তো ? অন্যদের অবগুনের দিকে দৃষ্টি যাচ্ছে না তো ? সবার প্রতিই খুব মিষ্টি-দৃষ্টি রাখতে হবে। বাবার তো কত অসংখ্য বাচ্চা। তাদের সবার প্রতিই তোমার এমনই মিষ্টি-দৃষ্টি রাখতে হবে। জগতের লোকেরা তো এও জানে না যে, রাধা-কৃষ্ণ আর লক্ষ্মী-নারায়ণের নিজেদের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কটা কি ? কিন্তু তা বোঝাবার জন্য চিত্রও তো বানানো হয়েছে। বাল্যকালে তারা ছিল রাধা-কৃষ্ণ হিসাবে, আর স্বয়ংম্বরের পর তারাই লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে প্রকাশ পায়। এখন বাবা এসে সে সবেরই স্মৃতিগুলিকে স্মরণ করাচ্ছেন- জানাচ্ছেন বাচ্চারা, তোমরাই একদা দেবতা ছিলে। বাচ্চারাও সেই সুরেই জানাচ্ছে, হ্যাঁ বাবা এটাই সত্য। জগতের লোকেরাও তো এমনই বলে- ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায়ঃ নমঃ।

যদিও জগতের ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরাও তা বলে, কিন্তু তারা তো এটাই জানে না যে, (বি.কে.) ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সেই (দেবী-দেবতা) ধর্ম স্থাপিত হয়, ব্রাহ্মণ-দেবতা-ক্ষত্রিয় এইভাবে তিন পর্যায়ে। আর এই ব্রাহ্মণদেরই বাবা হলেন ব্রহ্মা আর শিব। শিববাবা স্বয়ং আসেন অতি সাধারণ রূপেই। শিববাবার এই রথও যেমন নির্দ্দিষ্ট, আবার এই রথও (ব্রহ্মার স্থুল শরীর) তেমন ভাগ্যশালী রথ।

দীপাবলীর দিন মানুষ লক্ষ্মীদেবীকে আহ্বান করে ধন-সম্পদ চায়। জ্ঞানে আসার পূর্বে তোমরাও তা চাইতে। আর এখন, তোমরা নিজেরাই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন হতে চলেছো। জগতের লোকেরা তো সব সময়েই কিছু না কিছু ভিক্ষা চাইতেই থাকে। যেমন ভগবানের উদ্দেশ্যে কাঁদতেই থাকে, পুত্র দাও, ধন-সম্পদ দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সত্যযুগে তোমরা এসব কিছুই চাও না। যেহেতু শিববাবা তার বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সব ভাণ্ডারই ভরপুর করে রাখেন। কারণ বাবাই তো সেই স্বর্গ রচনা করেন। উনি তো আর এখানকার মতন নরক রচনা করেন না। যদিও এখানকার এই নরকেই আসতে হয়েছে ওনাকে, তা কেবলমাত্র তার সন্তানদের স্বর্গবাসী বানাতে। বর্তমানের এই দুনিয়াতে সবকিছুই অপবিত্র, তবুও লোকেরা বোঝে না যে, তারা নরকে বাস করছে। একদা যারা স্বর্গবাসী ছিল, তারাও এখন নরকবাসীতে পর্যবসিত হয় । অবশ্য এখন আবার তারাই স্বর্গবাসীই হতে চলেছে। শিববাবার অকালতখত্ (অবিনশ্বর আসন) হলেন এই ব্রহ্মাবাবা। যার মধ্যে অকালমূর্ত (জন্ম-মৃত্যু রহিত, অক্ষয়) পরমাত্মা এসে অধিষ্ঠিত হন। আত্মা স্বয়ং-ই অকালমূর্ত (যাকে কাল খেতে পারে না)। আত্মা অধিষ্ঠান করে কপালের দুই ভ্রুকুটীর মাঝে। তারই স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ কপালে তিলক ধারণ করা হয়। আজকাল তো আবার লোকেরা ষাঁড়ের কপালেও তিলক লাগিয়ে রাখে। অতএব কপালের এই ভ্রুকূটি স্থলটিতে ব্রহ্মাবাবা এবং শিববাবা উভয়েরই অধিষ্ঠান-স্থল। শিববাবা এসেই বাচ্চাদেরকে জ্ঞান প্রদান করেন। যেহেতু ইনি হলেন সর্ব-জ্ঞানে জ্ঞানী। উনি কখনও কারও মনের কথা জানার চেষ্টাও করেন না। যদিও উনি কারও মনের কথা জানার প্রয়াস করেন না, তবে হ্যাঁ, ওঁনাকে মনের মালিক বলা যেতে পারে, যেহেতু মনকেও তো আত্মা বলা হয়। অর্থাৎ উনিই সব আত্মার মালিক, কিন্তু শরীরের মালিক অবশ্যই নন। এদিকে জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীরা তো এমনও বলে-"আমিই প্রভু।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিববাবাই সব অবিনাশী আত্মার মালিক, আর উনি নিজেও পরম অবিনাশী। আর তোমরা শরীরধারীরা হচ্ছ বিনাশী সবকিছুর মালিক। কেন না তোমরা এক বিনাশী শরীর ত্যাগ করে অপর বিনাশী শরীরে অবস্থান করো। যেহেতু এরপর তোমদের বৈকুন্ঠে যেতে হবে, আর সেই নিমিত্তেই তোমাদের এই পঠন-পাঠন। যেমন প্রবাদ বাক্য আছে, যতক্ষণ শ্বাস - ততক্ষণ আশ (আশা)। তেমনি এই জ্ঞানের পাঠও যখন যার সম্পূর্ণ হবে, অটোমেটিক্যালী তখন তার এই বিনাশী শরীরেরও বিনাশ হবে। যদিও একথা তো সবার জানা আছে।

পরমাত্মার সংকল্প আসাতেই তো এই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টি হয়েছে। আবার যখন ওনার সময় হয়, তখন উনি স্বয়ং আসেন ওনার কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে। তাই বাবা বাচ্চাদের জানাচ্ছেন, যেমন বাচ্চারা তাদের নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করে থাকে, বাবা স্বয়ং-ও তেমনি ওনার নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করেন। তফাৎ শুধু একটাই, উনি জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের চক্রের মধ্যে পড়েন না। আর এই কারণেই ওনার এত মহিমা। বৈকুন্ঠেরও তেমনই মহিমা। জাগতিক সাধু-সন্ন্যাসীরা তো এটা জানেই না সত্যযুগে সুখ কেমন ধরণের হয়। যেহেতু ওখানকার সুখ ভোগের সৌভাগ্যই হয় না তাদের। সত্যযুগের বিষয়ে ওনারা শুনে থাকে যে, সেই সময়কালে সেখানে কংস ছিল। তাই তারা

অনুমান করে, সেই সময়কালেও সুখ ছিল না। তাই তো অন্যদেরকেও তারা তেমনই বোঝায় যে, সেখানকার সুখও কাক-বিষ্টার মতন। এসব শুনিয়েই অন্যদেরকেও সন্ন্যাস নেওয়ায়। কেবল তোমরা বাচ্চারাই স্বর্গের সেই প্রকৃত সুখকে জানতে পারো-যেহেতু একমাত্র তোমরাই তা পেয়ে থাকো। বাবা আরও বলছেন, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। এমনিতে মরতে তো হবে সবাইকেই। আর তোমাদেরকে সাথে করে (পরমধামে) নিয়ে যাবার কারণেই তো আমার এখানে আসা। তবুও কি তোমরা এমন অলস ভাবে বসে থাকবে এখনও। মশার ঝাঁকের মতন সবাইকেই নিয়ে যাবো। অতএব মাম্মা-বাবার মতন তেমন পুরুষার্থ করে যে যার নিজ নিজ উচ্চ-পদের অধিকারী হওয়া উচিত। যেহেতু ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান তোমরা। সত্যযুগ আর ত্রেতাতে যতজন দেবতা হবে, ঠিক ততজনই এখন ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান অর্থাৎ বি.কে. হবে। সুতরাং নিয়মানুসারে তোমাদের যেমন মা-বাবা উভয়ই আছে, তাছাড়াও আরও কেউ এমন একজন আছেন তাদেরও উপরে। যিনি তোমাদের সম্পূর্ণরূপে দেখাশোনাও করেন। (সেন্টারগুলিতে) নতুন নতুন বাচ্চারাও যেমন আসতে থাকবে, তাদের পঠন-পাঠনও একই ভাবে চলতে থাকবে। একেবারে অন্তিমক্ষণ পর্যন্ত এর বৃদ্ধি হতেই থাকবে। প্রত্যেকেরই দেখাশোনা কিন্তু খুব সুন্দর ভাবেই হওয়া উচিত। বাবা হলেন এই ঈশ্বরীয় বাগানের মালিক, আর তোমরা যারা সেন্টারে থাকো, তারা হলে মালী। আর মালীকেই তো গাছের প্রতি যত্ন নেওয়া ও দেখাশোনা করতে হয়। কিন্তু সেই মালী-ই যদি ঠিক না হয়, তবে সে আবার ভালমতন গাছের দেখাশোনা করবেই বা কি ভাবে। আবার যে মালী খুব ভাল ভাবে বাগান সাজিয়ে তোলে, তা দেখে বাগানের মালিক খুব খুশী হয়ে যায়। তখন বাগানের মালিক আবার নিজেও স্বচক্ষে তা দেখতে যান, কে কে খুব সুন্দর ভাবে বাগান সাজিয়েছে। তোমরা বাচ্চারাও তা জানো যে, এমন ভাল মালী কারা কারা। যে খুব ভাল মালী হয়, সে আবার পুরস্কারও পায়। তখন সেইসব মালীর প্রাপ্তিও বাড়তে থাকে আবার।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিজ নিজ লক্ষ্যেকে স্মরণে রাখতে হবে। কারণ এখন সময় হয়েছে ঘরে ফিরে যাওয়ার, অতএব সেই ঘরকেই সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণ বিনা তো শান্তিধামে পৌঁছানোই যায় না। আর সোজা সেখানে না পৌঁছতে পারলে শাস্তি ভোগ তো করতেই হবে। উপরন্তু, আগামীতে ভাল পদও পাওয়া যায় না। এই সঙ্গম সময়কালে যে বা যারা সূক্ষ্মবতনে যায়, তারা সেখান থেকেই সূক্ষ্ম সেবা করতে থাকে। আর এই সূক্ষ্ম-সেবায় প্রথম নম্বরে রয়েছেন ব্রহ্মাবাবা। দ্বিতীয় নম্বরে মাম্মা। যেহেতু দ্বিতীয় নম্বরেই যে আসতে হবে মাম্মাকে। অতএব বাচ্চারা, সেই মাম্মা-বাবাকেই যথার্থ রূপে অনুসরণ করবে তোমরা। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার মতনই অধিক মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে বাচ্চাদেরকে। সবাইকে মিষ্টি দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কারও কোনও প্রকার অবগুণের প্রতি নজর দেবে না।

২) ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের এই ছাত্রজীবনে নিজেকে সর্বদা খুশীতে রাখতে হবে। যতদিন বাঁচবে ততদিন রোজই এই পাঠ পড়তে হবে।

বরদান :- বাপদাদার আশার দীপকে জাগিয়ে তুলে কূল-দীপক হয়ে প্রকৃত দীপাবলী পালন করো

বিস্তার :- কথিত আছে দীপক বা প্রদীপ চার প্রকারের :-
১) ঘোর অন্ধকারকে দূর করে আলোর প্রকাশ আনে যে স্থূল মাটির প্রদীপ।
২) আত্মা-রূপী দীপক।
৩) কূল বা বংশের দীপক আর
৪) আশার দীপক।
মাটির দীপক তো তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরেই জ্বালিয়ে আসছ। কিন্তু এখন এই আত্মারূপী দীপককে সদা জাগ্রত রাখো। তোমাদের দ্বারা এমন কোনও কার্য যেন না হয়, যার ফলে কূলের সেই দীপক নিভে যায়। এমন কোনও চাল-চলন যেন না হয়, যার ফলে বাপদাদার আশার দীপক নিভে যায়। অতএব এখন এমন কূল-দীপক হয়ে ওঠো, যাতে বাপদাদার আশার দীপ-কে আলোকিত করে প্রকৃত দীপাবলী পালন করতে পারো।

স্লোগান :- পবিত্রতাই ব্রাহ্মণ জীবনের মূল ভিত। পৃথিবী উলোট-পালট হয়ে গেলেও তুমি যেন তোমার স্ব-ধর্মকে ছেড়ো না।